আবদুর রউফ চৌধুরী

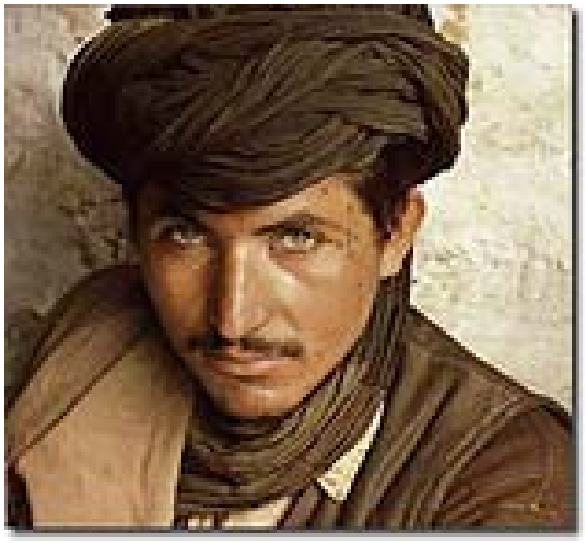

এক

ডিসেম্বরের শেষ। বরফে ঢাকা পাহাড়ী এলাকা। এক সন্ধ্যায় কোয়েটার ছোট বিমান বন্দরে অবতীর্ণ সেনাপতির বিমানকে বেলুচি বিপ্লবীদের অতুর্কিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হল। সারা রাত পাহারা দিতে হবে। প্রথম রাতে পাঠানো হল তিনজন সৈনিককে, অবশ্য সঙ্গে একটি বন্দুকও দেওয়া হল। একটি অস্ত্র দিয়ে তিনটি প্রাণ রক্ষা করা যাক-বা-না-যাক অন্ততপক্ষে একটি নিষ্প্রাণ এরোপ্লেনকে ত রক্ষা করা অসুবিধা হবে না– বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ। তিনজন প্রহরীর মধ্যে দুজন ছিল পাঞ্জাবি আর একজন পাঠান। তার পালা পড়ল রাতের প্রথম প্রহরে। পাঞ্জাবি দুজন একসঙ্গে প্রস্তাব করল, 'দেখো ভাই, এমন শীতের রাতে খোলা মাঠে হিমশীতল বাতাসে বন্দুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানেই হচ্ছে অসময়ে আজরাইলকে আহ্বান করা। তারচেয়ে বরং এই ছোট কুঠুরীতে, কয়লার আগুনের আঁচে, রেখে দেওয়া উত্তম। শুধু বন্দুকটি হাত-বদল হবে। আমরা অবশ্য ডিউটি করব খাতা-কলমে। আসলে আমরা দেউটি নিভিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে থাকব।' কথাটি বলেই হাসতে লাগল দুজন পাঞ্জাবি একসঙ্গে; কিন্তু তাদের হাসি থেমে গেল যখন তাদের নজরে পড়ল পাঠানের চোখ দুটো। সেই চোখ-দুটো দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা। আজরাইলের আমোঘ আওয়াজ উঠল পাঠানের মুখ দিয়ে, বলল, 'পাঠান কা বাচ্চা চির সাচ্চা। হাকিমের চেয়ে হুকুম বড়। জান যায় যাক চলে, হুকুম বেঁচে থাকবেই।' পাঠান অকারণে ফেটে পড়েছে দেখে পাঞ্জাবি দুজন চুপ হয়ে গেল। সকালে একপাশে স্থাপিত রাইফেলটি সরিয়ে নিতেই ধপাস করে পড়ে গেল পাঠানটি, তার লাশটি।

দুই

বৈকালিক ভ্রমণে এসেছে এক পেশাওয়ারী যুবক পেশোয়ার ও কোহাটের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত শরহাদ এলাকায়। এখানে পাকিস্তান সরকারের সব আইনই অচল, ব্রিটিশ আমল থেকে একই ব্যবস্থা চলে আসছে। যুবকটি এসে হানা দিল তার বন্ধু পছন্দ খানের দোকানে। বিপণী প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে একে-অন্যের কৌতুক উপভোগ করতে শুরু করল। কোকিল বিনিন্দিত কণ্ঠে কলহাস্যে জলভরা কলসি মাথায় চাপিয়ে দুটো করে চারটি সখী এগিয়ে চলল লীলায়িত অঙ্গ-ভঙ্গিমায়, জলকেলি সমাপনান্তে গৃহে ফেরা গোপিনীদের মত। এরমধ্যে একটি মেয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আগুন্তক বন্ধুটি মন্তব্য করল, 'ওই যে মেয়েটি দেখছ, ইয়ার, আমার মনে, তার মুক্তসুষম্য বাহুযুগলের লীলায়িত তরঙ্গে তার দেহকে পাওয়ার বাসনা জেগে উঠেছে। আর কলসিতে আলোর প্রতিফলনে তার বদনকে লোভনীয় করে তুলছে এমনভাবে যে, ওকে চুমু না কাটলে আমার জীবনই ব্যর্থ। সর্বোপরি তার কটিদেশের দোলন আমার মাথাকে মাতাল করে তুলছে। পান কর ইয়ার, আকণ্ঠ ভরে পান কর ওর বিলায়িত সৌন্দর্য সুধা।' পাণ্ডিত্য প্রকাশে উৎসুক পেশোয়ারী কলেজ ছাত্র; সেসঙ্গে নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে কুটকুট; কিন্তু হাসিতে যোগ দিতে পারল না তার পাঠান বন্ধুটি। সে দোকানের ভিতর প্রবেশ করে একটি বন্দুক নিয়ে ফিরে এসেই কোনও শব্দ উচ্চারণ না-করে সেই মেয়েটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে মারল। গুড়ুম। ধরাশায়ী হল নারীর কোমল দেহলতা। 'এ তুমি কী করলে? আর্ত-চিৎকারে গর্জে উঠল পেশোয়ারী।' খুনীর ভাবখানা যেন– পর-পুরুষের প্রশংসার যোগ্যতা অর্জন করা আপন স্ত্রীর ঘোরতর অপরাধ। শাস্তি শুধুই মৃত্যুদণ্ড।

তিন

এক পাঠান একই সিনেমা হলে প্রতিদিন যায়, একই ছবি দেখতে, তা লক্ষ্য করে এক পঞ্চনদ অধ্যুষিত অঞ্চলের বসবাসকারী পাঞ্জাবি ওকে জিজ্ঞেস করল, 'হে ভাই, তুমি রোজ একই ছবি দেখতে যাও কেন?' উত্তরে হিন্দুকুশের পাদদেশবাসী বলল, 'কে বলেছে?' পাঞ্জাবি বলল, 'কেন আমি নিজেই ত দেখছি গত তিন সপ্তাহ ধরে একই ছবি দেখতে তুমি একই সিনেমা হলে যাচ্ছ। একদিনও বাদ দাওনি।' মুখে ছাই মেখে পস্তুভাষী মস্তান বলল, 'পস্তানায় পড়েছি। ভেবেছিলাম একদিন না একদিন ত ট্রেনটি লেট করবে। শেষে বুঝলাম মানুষের সব আশা পূর্ণ হয় না।' পাশে দাঁড়ানো বাঙালি শ্রোতাকে পাঠানের এই কথার তাৎপর্য বোঝানোর পারদর্শিতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হল পাঞ্জাবি, পরের ত্রুটি প্রকাশে সফলতার মধ্যে নিজের দোষ ঢেকে নেওয়া যেন। পাঞ্জাবি বর্ণনা করল সেই সিনেমার দৃশ্য। লাহোরের দুর্বিষহ গরমে ঘর্মাক্ত কলেবরে, জৈন-ধর্মের দিগম্বর সম্প্রদায়ের অনুকরণে প্রকৃতির দুলালী নায়িকা নাইতে আসে নলকাতে। দর্শনেচ্ছুক আঁখির ঝাঁক, যেন গুড়ের টিনে পিঁপড়ার দল। শত চাতকের তৃষ্ণা নিয়ে যখন ছটফট দর্শককূল, ঠিক সেইমুহূর্তে মর্তলোক ভেদ করে একটি ট্রেন এসে প্রায় নিবাবরণ নায়িকাকে আবৃত করে ফেলে, কৃষ্ণের প্রদত্ত দ্রৌপদীর শাড়ির মত; তবে ড্রাইভার বা দৈব্যের দোষে ট্রেন যদি একবার লেট করত তা হলে পাঠানের এ-নিয়মিত তীর্থ যাত্রা ভঙ্গ হত। টিপ্পনি কেটে শ্রোতা বাঙালি তার পাঞ্জাবি বন্ধুকে বলল, 'তার প্রতিদিনের এই অভিসারের তুমিই একমাত্র সাক্ষী! অর্থাৎ তুমিও ভাইয়া তার গোড়া রোগে ভোগছ।' একথা শুনে পাঞ্জাবি সালাম জানিয়ে বিদায় নিল আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'বাঙ্গালকা আদমী যাদু জানে।'

চার

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি এলাকার এক পাঠানের কথা। কোহাট ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী এলাকায় এই উপজাতির বাস। তারা মুখে স্বীকার করে শুধু পাকিস্তানকে। প্রতিদানে পাকিস্তান মেনে নিয়েছে তাদের স্বতন্ত্র শাসন, ভিন্ন আইন-কাকুন। দোকানে দোকানে সারি সারি স্বহস্তে তৈরি রাইফেল রিভলবার সাজানো। বাংলাদেশে যেমন বুড়োরা বৈকালিক ভ্রমণে লাঠির সাহায্য নেন, যেমনি পশ্চিমা লোকজন কুকুরের, তেমনি এই উপজাতির জীবন সাথী হচ্ছে অস্ত্র। তাদের পছন্দের জিনিশ হচ্ছে একটি বন্দুক। সমর্থ সবাইর কাঁধে ঝোলানো থাকে বন্দুকটি। একদিন এক পাঠান উপজাতি বাজার থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মাটির দেওয়ালে ঘেরা ফটকের ফাঁকে তার দৃষ্টি গোচর হল একটি নারী মূর্তির উপর। সে রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো। পাশে একটি ছায়া মূর্তিও। ছায়া মূর্তিটি কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তন্দুরি চুলার আগুনের আভায় স্পষ্টতর হল নারীমূর্তির চেহারা। তার স্ত্রী। আর ছায়া মূর্তিটি তার ভাতিজা আল্লা-দিত্তা খানের। হাসির রেশ লেগে আছে স্ত্রীর সারা মুখে। তার হাসির স্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে পাঠানের সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বন্দুকে গুলি ভরল। আঙুল ট্রিগারে। ভূমিকম্প অনুভূত। ভয়াবহ কিয়ামত। আবার সেই হাস্য কলরোল। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল একটি পেঁচা, বিদ্রূপের ধ্বনি ছড়িয়ে। মনে হল সন্ধ্যার চন্দ্র খণ্ড-খণ্ড হয়ে খসে পড়ে পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, সীতার মরণ চিতা যেন। ট্রিগারে আঙুল ধনুকের মত বক্রাকার ধারণ করল। শব্দ হল। গুড়ুম, গুড়ুম। পাঠান বধূর দেহ ধরাশায়ী। নিস্তেজ। বারেক স্পন্দন। তারপর স্তব্ধ। নীরব। শেষ।